দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN-1.1 1999... ...

ক্ষুধার্ত শিক্ষক ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়বে কেমন করে?

শাহেদা ওবায়েদ

যুগ যুগ ধরে শিক্ষক সমাজকে জাতির বিবেক, জাতির মেরুদণ্ড বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর, তাই সর্বকালেই দলমত নির্বিশেষে তাদের সর্বোচ্চ সম্মানজনক অবস্থানে আসীন করা হয়ে থাকে। শিক্ষা একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত এবং একমাত্র শিক্ষকরাই শিক্ষার প্রজ্বলিত শিখাকে এক প্রজন্ম হতে আরেক প্রজন্ম পর্যন্ত অনির্বাণ করে রাখেন। বর্তমানের বাংলাদেশে মূল্যবোধ, সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গেলেও এখনও সাধারণ মানুষের নিকট শিক্ষক সম্প্রদায়ের সম্মানজনক ভাবমূর্তি প্রশ্নাতীত হয়ে রয়েছে। অপরদিকে, শত শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অধিকাংশ শিক্ষক সমাজ ছাত্রদের পাঠদানে সম্পূর্ণ জীবন আত্মনিয়োগ করে থাকেন।

বাংলাদেশের কিয়দংশ কিছুটা আধুনিক এবং উন্নত হলেও শিক্ষক সমাজে ভাগ্যের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। বিশেষ করে, গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্কুল, প্রাইভেট স্কুল ও কলেজের শিক্ষকবৃন্দ এখনও অবহেলিত এবং শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন থেকে বঞ্চিত। ছোট পরিসরের একটি ছাদের নিচে ৭/৮ জন পোষ্য নিয়ে গাদাগাদি করে বেঁচে থাকার ও দু'মুঠো খেয়ে না খেয়ে সমস্ত জীবনটাই তাদের জন্য একটি অনন্ত যুদ্ধের নামান্তর মাত্র। দারিদ্র্যের কষাঘাতে বহু শিক্ষক নিজেদের সন্তানদের কাঙ্ক্ষিত পড়াশুনা করাতে পারে না অথচ নিজেরা অন্যর সন্তান পড়িয়ে জীবন কাটিয়ে দেন। শ্রেণীকক্ষে সুষ্ঠুভাবে পাঠদানের জন্য পড়াশুনার উপযোগী শান্ত পরিবেশ, দৈনন্দিন জীবনের নিত্যসমস্যা থেকে টেনশনমুক্ত মানসিকতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা একজন শিক্ষকের জন্য একান্ত প্রয়োজন– এ কথাটি বোধকরি কোন সরকারই সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে চায়নি। শিক্ষক যদি সর্বক্ষণ নিজ পরিবারের পরের বেলার আহার ও মাথার ওপর তাদের পরবর্তী মাসের ভাড়ার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে, তাহলে শ্রেণীকক্ষে মনোযোগ সহকারে পাঠদান কি আদৌ সম্ভব? জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনের জন্য আবার তাদের প্রায়শঃ রাজপথে নেমে মিটিং, মিছিল ও অনশন করতে হচ্ছে শুধুমাত্র একটু মানুষের মত বেঁচে থাকার জন্য। ১৯৯৮-এর মে মাসে প্রাইমারী স্কুলের শত শত শিক্ষক মাথায় কাফন বেঁধে ঢাকার রাজপথে শুয়ে পড়ে অনশন করেছে। তাদের পাওনা ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য। একটি জাতির জন্য এর চেয়ে বড় লজ্জা আর কি হতে পারে!

বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আয়োজিত মহাসমাবেশে শত শত প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক উপস্থিত হয়েছিলেন। শেরে বাংলানগর বাণিজ্য মেলা উদ্যানে গত ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৮ তারিখে এক বুক আশা নিয়ে যে, হয়তো তাদের বহুদিনের প্রয়োজনীয় দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে আশাব্যঞ্জক প্রতিশ্রুতি ও গঠনমূলক কিছু দিকনির্দেশনা পাবেন। কারণ সে মহাসমাবেশের প্রধান অতিথি ছিলেন স্বয়ং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তারপাশে মঞ্চ অলংকৃত করে রেখেছিলেন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষামন্ত্রী, সচিব ও সমিতির নেতৃবৃন্দ। পরদিনের দৈনিকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের শিরোনাম ছিল 'আগামী অর্থ বছরে শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ ৮০% বৃদ্ধি' কিন্তু তার পাশেই আরেকটি শিরোনাম পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে– 'শিক্ষকদের মহাসমাবেশে চেয়ার ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, সড়ক ব্যারিকেড'– দৈনিক ইনকিলাব ২০-১২-৯৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার স্বভাবসুলভ বক্তব্যের মাঝে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যথা আগামী অর্থ বছরে প্রাইমারী প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ ৭১% উন্নীত করা হবে। শিক্ষকদের জনকল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হবে এবং সে ট্রাস্ট থেকে ভবিষ্যতে এসব শিক্ষকদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করা হবে এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য দাবী পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে। তাই তিনি শিক্ষকদের ধৈর্যধারণ করতে বলেন।

তিনি শিক্ষকদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের সাথে সঙ্গতি রেখে পূর্বেই তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছিল। যার ফলে তারা বর্তমানে ৫২৫ টাকার পরিবর্তে ৮১২ টাকা, ৬৫১ টাকার পরিবর্তে ১০০৭ টাকা ও ৭৪০ টাকার পরিবর্তে ১১৫৩ টাকা পাচ্ছেন। তিনি তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দিয়ে বলেন যে, বন্যা-উত্তর পরিস্থিতিতে সরকারকে ২ কোটি লোকের খাদ্য কিনতে হয়েছে। তাই, তাদের জন্য বর্তমানে কিছু করা সম্ভব নয়, পর্যায়ক্রমে তাদের দাবী পূরণের আশ্বাস দেন। মানুষ গড়ার কারিগরদের 'ক্ষুধামুক্ত দেশ গড়ার জন্য, নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু যেসব শিক্ষকগণ প্রতিনিয়ত ক্ষুধার সাথে অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত তাদের দ্বারা ক্ষুধামুক্ত দেশ গড়া সম্ভব কি? বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ৮১২ টাকা দিয়ে একটি গৃহপালিত জানোয়ারও পুরো মাস বাঁচতে পারবে কি-না সন্দেহ আর একজন মানুষ ও তার পোষ্য তো দূরের কথা। আসলে দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেও নিয়ন্ত্রিত থাকলে বেতন বৃদ্ধির জন্য কোন আন্দোলন তেমন জোরদার হত বলে মনে হয় না। কারণ টাকা তো সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যই দরকার।

আর মহাসমাবেশে দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো যদি ভবিষ্যতেই বাস্তবায়িত হয় তাহলে অর্ধাহারে সংগ্রামরত শিক্ষকদের বর্তমান কি করে চলবে? তাই প্রধানমন্ত্রী ও তার কড়া নিরাপত্তা বাহিনী সমাবেশ স্থান ত্যাগ করার সাথে সাথে হতাশায় ক্রুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ চেয়ার ভেঙ্গে তা দিয়ে মঞ্চে বসা সমিতির কতিপয় নেতাকে আক্রমণ করতে যায়। ক্ষোভে তারা প্যান্ডেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে কয়েকজন শিক্ষককে সাময়িকভাবে গ্রেফতার করে। শিক্ষকগণ পরে শেরে বাংলার প্রধান সড়ক ১৫/২০ মিনিট অবরোধ করে রাখার ফলে বিশাল যানজটের সৃষ্টি হয়। নিরীহ শিক্ষকদের বৃহত্তর স্বার্থে বিকিয়ে দেয়া সমিতির নেতারা ইত্যবসরে সভাস্থল ত্যাগ করে।

একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সারা জীবনের শিক্ষার মান নির্ভর করে ছোটবেলার প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার মজবুত ভিতের উপর। কিন্তু সেই প্রাইমারী শিক্ষকই যদি অনাহারে দিনাতিপাত করে, তাহলে তারা কি করে পাঠদান করবে। নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সন্তানরা যেহেতু দেশের উচ্চমানের ব্যয়বহুল স্কুলে অথবা বিদেশে পড়ে সে কারণেই হয়ত দেশের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষকবৃন্দ অথবা ছাত্র সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে এদের ততটা মাথাব্যথা নেই। বিদেশে লেখাপড়া করা নিশ্চয়ই কোন দোষের কথা নয়, কিন্তু দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আরও মনোযোগী হলে জনসাধারণ উপকৃত হবে। অথচ যখনই কোন পাবলিক পরীক্ষা অথবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল খারাপ হয় তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা শিক্ষকদের ঢালাওভাবে দোষারোপ করে থাকেন। কিন্তু কি প্রতিকূল অবস্থায় তারা কাজ করেন তা কখনও তলিয়ে দেখেন না।

বর্তমানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে কিছু ছাত্রী যৌন হয়রানির অভিযোগ এনে রাস্তায় মিছিলের মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছে। এটি অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। অবিলম্বে এর সুষ্ঠু তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ দু'চারজনের জন্য সমস্ত নিবেদিত প্রাণ শিক্ষককুলের মাথা হেঁট হতে দেয়া যায় না। প্রায়শ গৃহ শিক্ষকতার কারণে শিক্ষকদের ঢালাওভাবে দোষারোপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কেন? অভিভাবকরাই তো সন্তানদের নিয়ে শিক্ষকদের দ্বারপ্রান্তে ধরনা দেয়। কোন শিক্ষক তো জোর করে পড়াতে যায় না। অভিভাবকদের আপত্তি থাকলে তারা তাদের সন্তানদের গৃহশিক্ষকের নিকট না পাঠালেই হয়। দ্বিতীয়ত, দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির আনুপাতিক হারের তুলনায় স্কুলের সংখ্যা সীমিতই রয়ে গেছে। ফলে শ্রেণীকক্ষে গাদাগাদি করে বসা ছাত্রদের একক যত্ন করা সম্ভব হয় না। গৃহশিক্ষক স্বল্পসংখ্যক ছাত্রকে মনোযোগ সহকারে পড়িয়ে তাদের সুদক্ষ করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। তৃতীয়ত, সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকদের একটিমাত্র পুঁজি তুল তাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা।

সংসারের অভাব দূর করার কয়েকটি টাকা উপার্জন করার জন্য যদি তারা তাদের শিক্ষাকে কাজে লাগান তাহলে ক্ষতি কি? তারা তো কিছু আমলা, পুলিশ ও অন্যান্য কর্মকর্তার মত ঘুষ নেন না, ভয়ভীতি দেখিয়ে বলপূর্বক টাকা আদায় করেন না অথবা পদ, চেয়ার অথবা রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে চাঁদা আদায় করেন না।

বর্তমান সরকার বারংবার বলেছেন যে, স্বনির্ভর শিক্ষিত বাংলাদেশ গড়াই তাদের মূল লক্ষ্য। তাই যদি হয় তাহলে শিক্ষকদের শিক্ষার যোগ্যতা ও মেধা অনুযায়ী মূল্যায়ন করে সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। একজন পিএইচডিধারী শিক্ষককে হয়রানি করার জন্য গ্রামের কোন কলেজে পাঠানো বন্ধ করতে হবে যেখানে সাধারণ গ্রাজুয়েটই পাঠদান করতে সক্ষম। তা না হলে একজন শিক্ষককে নাজেহাল করতে গিয়ে শত শত ছাত্রের শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত করে দেয়া হবে।